রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৪ বৈশাখ ১৪১৭
১৭ এপ্রিল ২০১০

বাণী

আমি ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ বিশ্ব দরবারে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই মুজিবনগর সরকারের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান-কে যাঁদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক-সংগঠকসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল স্তরের জনগণকে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন তথা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'দিন বদলের সনদ' ঘোষণা করেছেন। পরিবর্তনের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানাই।

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবসে' দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানুক এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক-এই কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিলুর রহমান

মুজিবনগর সরকার – বাংলাদেশের প্রথম সরকার

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

আপাতদৃষ্টিতে মুজিবনগর সরকার প্রবাসী সরকার হলেও বাস্তবে তা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। নানা বিচারে এই সরকারের বেশ কিছু ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, এই সরকার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ করে '৭১-এর ১৭ এপ্রিল। উল্লেখ্য, তখন এই অঞ্চল ছিল স্বাধীন, এবং এর নতুন নাম হয় মুজিবনগর। আরো উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির দ্বিতীয়টি নেই যে, এ ধরণের সরকার দেশের স্বাধীন ভূমিতে শপথ গ্রহণ করেছে। প্রবাসী সরকার সবসময় বন্ধুভাবাপন্ন সহযোগী দেশের মাটিতে গঠিত হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে মুজিবনগরই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। অবশ্য নিরাপত্তার কারণে রাজধানীর সদর দফতর ছিল কলকাতায়। দ্বিতীয়ত, এই সরকার '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এই সরকার ছিল সম্পূর্ণ সাংবিধানিক, প্রতিনিধিত্বশীল ও বৈধ। তৃতীয়ত, এই সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম মুক্তিযুদ্ধ। 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দবন্ধটির শুরুতে আমরা যে 'দীর্ঘ' বিশেষণটি ব্যবহার করি, তা আবেগাশ্রিত, তাতে ইতিহাস নেই। ইতিহাস হল, আমাদের '৭১-এর যুদ্ধটি ছিল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম মুক্তিযুদ্ধ।

'৭১-এর ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথতলা বা মুজিবনগরে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। ১০ এপ্রিল এই সরকার স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করে এবং উলেখ করে যে, স্বাধীনতার ঘোষণা ইতঃপূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করেছেন। সেদিনই বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত হবে; এবং হয়েছিলও তাই। অর্থাৎ তাজউদ্দিন আহমদের দূরদর্শিতা ছিল। নেতাদের মধ্যে এমন দূরদর্শিতা কাম্য। তার-ই বিচক্ষণ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

ছয় সদস্যের মন্ত্রীসভা ছিলো এই সরকারের কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাষ্ট্রপতি; তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য সদস্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান। সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল বারোটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। সরকারের কর্মকাণ্ডে তিন ধরণের বিভাজন ছিল: বেসামরিক প্রশাসন, সামরিক বিষয়াবলী (প্রধান বিষয়) এবং স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা। প্রধানত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা এই সরকারের প্রধান কাজ হলেও যুদ্ধপরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও এই সরকার সচেতন ছিল এবং তার প্রমাণ ছিল পরিকল্পনা সেল গঠন। সেলটির প্রধান ছিলেন যশস্বী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী। অন্যান্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন, ড. এস আর বোস এবং ড. আনিসুজ্জামান।

'৭২ এর ২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের গণহত্যার অভিযান শুরু হলে সামরিক-বেসামরিক বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। সূচনা-পর্বে বোধগম্য কারণে এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন এবং সমন্বয়হীন, এবং যার ফলে বিপর্যয়-ও হয়েছিল। কিন্তু ১৭ জুলাই মুজিবনগর সরকারের দিকনির্দেশনা ও উদ্যোগে সারা বাংলাদেশকে যুদ্ধের এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক সেক্টর একজন অধিনায়কের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য দশ নম্বর সেক্টর নৌ-সেক্টর হবার কারণে যুদ্ধের মানচিত্রে দৃশ্যমান ছিল না। উপরন্তু ছিল বিশেষ বাহিনী। যেমন জিয়াউর রহমানের অধীন ছিল জেড ফোর্স, খালেদ মোশারফের অধীন ছিল কে ফোর্স এবং এস ফোর্স ছিল কে. এম. শফিউলাহ্‌র অধীন।

বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কূটনৈতিক তৎপরতার সূচনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের *To The People of the World* শীর্ষক একটি বিবৃতি প্রচারের মাধ্যমে। বিবৃতির সমাপ্তি বক্তব্য ছিল: "In our struggle for survival we seek the friendship of all people, the big power and the small... We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood. Everyday this is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed. In the name of humanity act now and earn our undying friendship."

এটা জানা কথা যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের জনমত ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। এমনকি মার্কিন সরকার বিরোধিতা করলেও অসংখ্য মার্কিন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বিজয় অর্জনের অনেক আগেই বিশ্বজনমতের রায়ে আমাদের নৈতিক বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল এবং যার সবটুকু কৃতিত্ব তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বঙ্গবন্ধুর নামে গঠিত ও পরিচালিত মুজিবনগর সরকারের। উপরন্তু এই সরকারের সাফল্যের কারণেই ১৬ ডিসেম্বরের আগেই ভুটান ও ভারত বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য দেয়া সম্ভব হয়নি। তবুও তার একটি চিঠি নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল (৪ ডিসেম্বর), যার শেষাংশে বলা হয়েছিল: "There can be no proper evaluation of the present situation, its causes, present state and future solutions, without Bangladesh being given a hearing". আর এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন-এর তীর্যক মন্তব্যটি ছিল: "Without hearing the voice of Bangladesh is like playing Hamlet without the Prince of Denmark."

ফিরে দেখে নির্দ্বিধ হয়ে বলা যায়, মুজিবনগর সরকার– বাংলাদেশের প্রথম সরকার ছিল একটি সফল সরকার। সাফল্য ছিল মাত্র ন'মাসে বিজয় অর্জন করা। সাফল্য ছিল বিশ্বজনমতকে বাংলাদেশের সপক্ষে টেনে আনা। সাফল্য ছিল সামরিক বিজয়ের আগেই কূটনৈতিক সাফল্যের সূচক হিসেবে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি অর্জন করা। আর সব সাফল্যের অনুঘটক ছিল তাজউদ্দিন আহমদের প্রতিকূলতা-বিজয়ী সঠিক ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ বৈশাখ ১৪১৭
১৭ এপ্রিল ২০১০

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল এক চিরভাস্বর দিন। ১৯৭১ সালের এইদিনে বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং ঘোষিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। সেদিন থেকে এ স্থানটি মুজিবনগর নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী শুরু হয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি জাতির জনককে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রীসভার সদস্য করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

মুক্তিকামী সকল রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশাসহ সকলস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পরাজিত শত্রুরা চুপ করে বসে থাকেনি। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর অতিক্রম না হতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আড়াই মাসের ব্যবধানে ৩রা নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ চার জাতীয় নেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার-মাগফেরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ৩৯ বছর পর হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করার মাধ্যমে জাতি কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। জেলখানায় নিহত ৪ নেতার হত্যা মামলার পুনর্বিচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জাতির চরম দুর্দিনেও যে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা উর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে চলা যায়, ১৭ই এপ্রিল জাতীয় ইতিহাসে তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি দেশবাসীকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ) এম পি
প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৭ এপ্রিল আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক গৌরবজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম বৈধ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী বাঙ্গালী জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তবে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী যে সে স্বপ্ন কোন দিন পূরণ হতে দেবেনা তা ১৯৭০ এর নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সে সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। তাই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলে বাংলার গণ প্রতিনিধিরা শেখ মুজিবকে সর্বসম্মতভাবে সরকার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধ হয় আরও বেশী সংগঠিত, সুসংহত ও দুর্বার।

নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর এদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে জনগণের বিপুল ভোটে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আজ ক্ষমতায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অন্যায় অত্যাচার ও প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করে সকলের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে সগর্বে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবো।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসে দেশবাসীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

(ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ), এম পি)

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ১৭-০৪-২০১০

বাণী

মুজিবনগর দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরভাস্বর একদিন। ১৯৭১ সালের এদিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যা আমাদের প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপরিচয়ের দিন।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ বাংগালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তারই আনুষ্ঠানিক রূপ পায় মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংগালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে এ সরকার গঠিত হয়েছিল। এই সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধে নূতন করে প্রাণ সঞ্চার হয়; যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে নতুন উদ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নতুন দেশ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতিসহ বাংগালীর ন্যায়সংগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত তৈরী হয় এবং বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক সোচ্চার হয়। সুতরাং আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধটাই পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে এবং তাঁর সম্মোহনী ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ছায়াতলে। মূলতঃ জাতির জনকের ভিশনারী নেতৃত্বই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আমাদের আজকের নবপ্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। আজকের এ শুভদিনে আসুন আমরা সকলে মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত)

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১

ড. মুনতাসীর মামুন

আজ থেকে ৩৯ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুজিবনগর সরকার। আসলে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত এই সরকারের নাম বাংলাদেশ সরকার কিন্তু সাধারণ্যে তা পরিচিত মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার নামে। উল্লেখ্য যে, গত শতকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো একমাত্র ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার।

মুজিবনগর সরকার ছিল ধারাবাহিকতার ফসল। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। সে সময় এ ধরণের একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিলো মানুষের মনোবল অটুট রাখা ও প্রবাসী সরকারের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য। প্রথম বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ এপ্রিল পালিত হচ্ছে মুজিবনগর দিবস।

১৭ এপ্রিলের এক সপ্তাহ আগে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে ১৭ থেকে ১০ এপ্রিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে ৪ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন তাজউদ্দিন আহমদ। এরপর বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিন আহমদের মনে এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, সরকার গঠন করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি না করলে স্বাধীনতার কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তখনই ঠিক করা হয় নতুন দেশটির নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গবন্ধু যে ক'জনকে নিয়ে হাইকমান্ড গঠন করেছিলেন, প্রথম মন্ত্রীসভায় তাঁরাই থাকবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

এরপর ঠিক করা হয় ১০ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ একটি বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতার ইংরেজি খসড়াটি করেন রেহমান সোবহান। এর একটি লাইন সবার ভালো লেগেছিল, তা' হলো– "Pakistan is dead and buried under mountain of corpses." ১০ তারিখ বিশ্ববাসী শুনলেন স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। এর আগে অবশ্য ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা। এবং তার আরও পরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমান।

মুজিবনগর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, একটি সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ সেই সরকারের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। ঘোষণাটি ২৪ অনুচ্ছেদের। ঘোষণায় মূলত যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল, তা হলো– ১৯৭০ সালের যুক্ত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। ১৬৯ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭। এ কারণে, জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু পরে বেআইনি ও একতরফাভাবে তা স্থগিত রাখা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের সম্মান ও সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান। এ পটভূমিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে অনুমোদন করছে।

ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। এ ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাক্য হচ্ছে–

১. "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করছি।"

২. বাংলাদেশের মানুষের শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়মূলক সরকার প্রদানের [জন্য] যা যা করা দরকার তা করবেন।

এ ঘোষণায়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তারিখ ঘোষিত হয় যা নিয়ে এখনও হাস্যকর সব বিতর্ক হয়। মুজিবনগর ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে লেখা আছে– "আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।"

এই তারিখে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি" করেন। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। শেষ হয় মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়। এর পরের পর্যায় হলো সরকার গঠন, শপথ ও কার্যক্রম পরিচালনা।

১১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রচার করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছিলো মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে। এ ভাষণটির কথা অনেকের মনে নেই; কারণ কোথাও এর উল্লেখ নেই। উপসংহারে যে মন্তব্যগুলো করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ–

১. আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।

২. আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরও অনেক রক্তক্ষয় ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে।

৩. এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ... এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ।

১৩ই এপ্রিলের মধ্যে হাইকমান্ডের সদস্যরা মন্ত্রীসভা গঠন চূড়ান্ত করলেন। আপাতত অন্তর্দ্বন্দ্ব সবাই ভুলে গেলেন। ১৪ই এপ্রিল ঠিক হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু হয়ত পাকিস্তানিদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেল। ১৪ তারিখ চুয়াডাঙ্গায় সাংঘাতিকভাবে বোমাবর্ষণ করা হলো। তারপর মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ঠিক হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। এবার আর কাউকে জানানো হলো না কোথায় শপথ হবে। ১৭ তারিখ কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে আমিরুল ইসলাম পৌঁছেন বৈদ্যনাথতলায়। ১১টার দিকে তাঁরা সেখানে পৌঁছান।

মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম ছিলেন ঝিনেদার এস.ডি.পি.ও.। যুদ্ধ করতে করতে তিনি তখন সীমান্তের কাছাকাছি। তিনি জানিয়েছেন, তৌফিক-ই-ইলাহী তাঁকে খবর পাঠান দ্রুত বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছাতে হবে। সেখনে পৌঁছে তিনি দেখেন নিরাভরণ একটি মঞ্চ। তাঁকে জানানো হয়, মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করবে এবং গার্ড অফ অনারের বন্দোবস্ত তাঁকে করতে হবে। তিনি আশপাশে আনসার পুলিশ যাদের পেলেন তাদের নিয়েই গার্ড অফ অনার দিলেন।

কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী আমাকে বলেছেন, "শপথ গ্রহণের আগে গার্ড অফ অনার হয় কিভাবে? সত্যিকার গার্ড অফ অনার দেয়া হয় পরে এবং আমি সেখানে ছিলাম।"

ব্যারিস্টার ইসলাম লিখেছেন– "কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইস